†gŠjev`x Rw½‡`i we¯§qKi DÌvb N‡U‡Q evsjv‡`‡k| kvqL Ave`i ingvb, wmwÏKi ingvb evsjv fvB‡qi g‡Zv GK‡kYxi Rw½‡bZv Bmjv‡gi bvg fvw½‡q AcZrciZv Pvjv‡”Q| wRnv‡`i bv‡g, Bmjvg Kv‡q‡gi bv‡g, mšvmx ZrciZv‡K Rv‡qR Kivi †Póv Pj‡Q| A_P Bmjv‡gi †Kv_vI Rw½ev`‡K mg_b Kiv nqwb...

wj‡L‡Qb Awid Lvb wgiY

ধর্মের নামে মানুষ হত্যা ইসলাম কী বলে

gnvbex nhiZ gnv¤§` (m.) ej‡jb, Ôewb BmivBwjiv 72wU fv‡M wef³ n‡qwQj, Avgvi D¤§Ziv 73wU `‡j wef³ n‡q co‡e| Gi g‡a¨ GKwUgvÎ `j mmsev`cvß, ewK 72wU `jB Rvnvbwg n‡e|Õ

wRÁvmv Kiv n‡jv, ÔKviv mmsev`cvß n‡e?Õ

ivmyj (m.) ej‡jb, Ô hviv Avj-vn I Avj-vni ivm‡ji c_ mwVKfv‡e AbmiY Ki‡e|Õ

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর এই বিখ্যাত হাদিসটি সবারই জানা। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করেছিল তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর থেকেই। মুসলমানরা নিজেরা নিজেরা মারামারি, কাটাকাটি আর শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (স.) ইসলামের যে মূল চেতনা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন তা নষ্ট করে ফেলে মুসলমানরাই। সে কারণেই খেলাফতের নামে প্রতিষ্ঠিত হলো রাজতন্ত্র। ভোগ-বিলাস আর অনাচার-অবিচারে এক জাতি নাম ধারণ করেও নিজেদের মধ্যেই তারা বহু জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়লো।

হযরত মুহাম্মদ (স.) এরকম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথনির্দেশনাও দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আমি তোমাদের কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি। যত দিন তোমরা এ দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সেই দুটি জিনিস হলো কোরআন ও হাদিস।' এভাবে মহানবী (স.) নিজেই সঠিক দল কোনটি তা চেনার মাপকাঠি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

অথচ পৃথিবীতে ইসলামের আবির্ভাব, বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার সাড়ে চৌদ্দশ বছর পর একদল লোক মনে করছে, ইসলামকে শক্ত করে প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আর এ দায়িত্বও যেন তাদেরই। এরা আরো মনে করছে, ইসলামের যে শ্বাশত-শান্তির পথ মহানবী (স.) প্রচার করেছেন এবং সারা জীবন অনুসরণ করে গেছেন, সেই সুন্দর পথ অবলম্বন করা যেন এখন আর যথেষ্ট নয়। এর বদলে এখন দরকার বোমা। মানুষ

মানুষের মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি যেমন লোভ-লালসা তথা ষড়রিপু দমন করে আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা অর্জন করা, মুসলমানদের কাছে 'জিহাদে আকবর' বা 'বড় জিহাদ' বলে পরিচিত। কোরআনে বলা হয়েছে, 'বড় জিহাদ' হলো কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা অর্জনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। পবিত্র কোরআনে 'জিহাদে আসগর' বা ছোট জিহাদের কথাও বলা হয়েছে

হত্যা। অর্থাৎ এসব কথিত ধর্মপ্রেমী লোকের কর্মকাণ্ডের সারমর্ম এই যে, ইসলাম এখন আর প্রচারের বিষয় নয়, ইসলাম এখন চাপিয়ে দেয়ার বিষয়। আর লোকজন তা না মানলে বোমা মারতে হবে।

কিছুদিন আগে জেএমবির সুইসাইড স্কোয়াডের এক সদস্য পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ইফতেখার হাসান আল মামুন নামের এই লোক ঝালকাঠিতে বোমা হামলা করতে গিয়ে আহতাবস্থায় ধরা পড়ে। পরে সে স্বীকারোক্তিতে বলেছে, 'মানব রচিত আইন মানি না, তাগুতি আইন মানি না, কোরআনি আইন চালু কর। যারা মানব রচিত আইনে বিচারকাজ চালাচ্ছে তারা খোদাদ্রোহী ও হত্যাযোগ্য, ইসলামী আইন কায়েম করার জন্য আমি বিচারকদের ওপর বোমা মেরেছি, আমি শহীদ হতে চেয়েছিলাম।'

আমাদের চারপাশে আরো হাজার হাজার মামুন বেড়ে উঠছে এরকম আত্মঘাতী ও মিথ্যা ধারণা নিয়ে। ইসলামের মূল থেকে সরে গিয়ে এরা মেতে উঠেছে ধর্মের নামে হত্যাযজ্ঞে। অথচ ইসলামে কোথাও কি এ ধরনের কথা বলা হয়েছে? বিদায় হজের ভাষণে হযরত মুহাম্মদ (স.) স্পষ্ট ভাষায় উম্মতদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'সাবধান! ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি কোরো না। অতীতে বহু জাতি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

অথচ ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে একশ্রেণীর জঙ্গি-উগ্রবাদী ধর্ম নিয়ে চূড়ান্ত রকম বাড়াবাড়ি করছে। যারা মহানবী (স.)-এর নির্দেশনা মানে না, তারা কীভাবে, কোন ধৃষ্টতাবলে কোরআনের শাসন চালুর কথা বলে? আল্লাহর আইন চালুর কথা বলে?

কোরআনে 'যুদ্ধ' সম্পর্কে কী বলা হয়েছে

মুফতি হান্নান আর শায়খ রহমানরা যে জিহাদকে যুদ্ধ বলে চালিয়ে দিতে চাইছে, সেই যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআনে কী বলা হয়েছে?

১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ঐ সমস্ত ধনী লোকদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন যারা অনুৎপাদনশীল আর্থিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে অর্থ উপার্জন করে (যেমন সুদ, ঘুষ, মাল মজুদ ইত্যাদি)। (সূরা বাকারা: ২৭৮, ২৭৯)।

এই যদি হয় কোরআনের কথা, তাহলে তা প্রথমেই যুদ্ধ করতে হয় ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী বীমা, ইসলামী সমবায় সমিতিগুলোর বিরুদ্ধে। কারণ তারা ইসলামের নামে সব রকমের সুদ, মজুদদারী আর দাদনের ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

২. দ্বিতীয়ত কোরআনে আদম (আ.)-এর এক ছেলে কর্তৃক অন্য ছেলের হত্যা করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে সে জন পুরো মানব জাতিকেই হত্যা করলো। ব্যতিক্রম হলো কেউ আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করলে তা বৈধ (সূরা মায়িদাহ্: ২৭, ২৮, ৩২)।

৩. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চায় আর আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। কারণ আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা মায়িদাহ্ : ৬৪)।

৪. যেসব জাতি প্রতিনিয়ত চুক্তি ভঙ্গ করে, আর যুদ্ধ শুরু করে দেয় আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। এসব যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আল্লাহ অন্যান্য শান্তিপ্রিয় জাতিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। (দেখুন সূরা আনফাল, ৫৬)।

৫. কোরআনে আরো বলা হয়েছে যে যুদ্ধবাজরা গণহত্যা করে তার অপবাদ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যেন প্রকৃত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়া যায়। (সূরা তওবা: ৯, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত)। আমাদের দেশে মুফতি হান্নান আর বাংলা ভাইরা কী করছে? তারা নিজেদের মুসলমান দাবি করে, যাদেরকে হত্যা করছে তারাও মুসলমান। অথচ এর নাম দিয়েছে জিহাদ। তাহলে কি কোরআন অনুসারেই প্রমাণ হয়ে যায় না যে এরা ইসলামের শত্রু!

৬. কোরআনে বলা হয়েছে যে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন অবশ্যই খুন-খারাবি বন্ধ করে ফেলতে হবে। এবং যুদ্ধবন্দীদের হয় বিনিময় করতে হবে বা তাদের মুক্ত করে দিতে হবে। (সূরা মুহাম্মদ: ৪)।

পুরো কোরআন শরীফ জুড়ে এই হলো যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা। যারা আজ বোমা ফাটিয়ে দেশে ইসলাম ও ইসলামী আইন কায়েম করতে চায় তারাই সুযোগ পেলে বড় গলায় বলতে ছাড়ে না যে তরবারির জোরে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ এখন তাদের সবার হাতে বোমা। ইসলামের ছদ্মবেশে এরাই আজ ইসলামের বড় শত্রু।

ইসলামের যে শ্বাশত-শান্তির পথ মহানবী (স.) প্রচার করেছেন এবং সারা জীবন অনুসরণ করে গেছেন, সেই সুন্দর পথ অবলম্বন করা যেন এখন আর যথেষ্ট নয়। এর বদলে এখন দরকার বোমা। মানুষ হত্যা। অর্থাৎ এসব কথিত ধর্মপ্রেমী লোকের কর্মকান্ডের সারমর্ম এই যে, ইসলাম এখন আর প্রচারের বিষয় নয়, ইসলাম এখন চাপিয়ে দেয়ার বিষয়। আর লোকজন তা না মানলে বোমা মারতে হবে

ড. গালিব, বাংলা ভাই, মুফতি হান্নান, মাওলানা মাসুদ এবং এদের অনুগতরা উঠে পড়ে লেগেছে বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম করতে। যেন হাজার বছর ধরে এখানে বংশপরম্পরায় বেড়ে ওঠা মুসলমানরা সব অজ্ঞ, মূর্খ। এসব উগ্রপন্থিরা জানেই না যে এ অঞ্চলে ইসলামের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে শান্তি ও উদারতার ধারায়। যুগে যুগে সুফি-সাধক, পীর-দরবেশরা এখানে ইসলামের যে শ্বাশত বাণী প্রচার করেছেন, মানুষের কাছে রাসুল (স.) যে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, তাতে কোনো হানাহানি, জিঘাংসার চিহ্ন ছিল না। ইতিহাসের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অনিবার্যতায় যেসব যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, তাতে মানষ খুন করে, জবরদস্তি করে ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার ঘটনা বিরল। আর আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে জিহাদের ডাক দেয়া হচ্ছে।

কোরআনের জিহাদ বনাম জঙ্গিদের জিহাদ

মানুষের মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি যেমন লোভ-লালসা তথা ষড়রিপু দমন করে আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা অর্জন করা, মুসলমানদের কাছে 'জিহাদে আকবর' বা 'বড় জিহাদ' বলে পরিচিত। কোরআনে বলা হয়েছে, 'বড় জিহাদ' হলো কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা অর্জনের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। পবিত্র কোরআনে 'জিহাদে আসগর' বা ছোট জিহাদের কথাও বলা হয়েছে। এই ছোট জিহাদ হলো পার্থিব অর্থে আমরা যাকে সংগ্রাম বলে মনে করি তা। এই অর্থে সংগ্রাম কেবল তাদের বিরুদ্ধেই বৈধ, যারা অত্যাচারী। এই সংগ্রামে বিন্দুমাত্র নিজের স্বার্থ থাকতে পারবে না। (সূরা বাকারা, ১৯০)। কিন্তু আমাদের শায়খ রহমান আর ড. গালিবেরা জিহাদের নামে নিজেদের

আখের গুছিয়েছে। বাংলা ভাই চাঁদাবাজি করে আর ইসলামের নাম ভাঙিয়ে অবৈধ উশর (ট্যাক্স) আদায় করে।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন, 'ইসলামী পরিভাষা অনুসারে জিহাদ হলো পৃথিবীতে কোনো শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কারো সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নিয়োগ করা। আর কোনো মুসলমানের কাছেই আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ প্রাপ্তির চেয়ে বড় কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। এবং তা সম্ভব একমাত্র তাঁর কাছে পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই। সব স্বেচ্ছাচার, অশুভ কামনা ও কদর্যতা থেকে মুক্ত থেকে ভালো আর সুন্দরের প্রতি চিরন্তন আনুগত্যের দুর্বার প্রচেষ্টাকেই বলা হয় জিহাদ।'

এই হলো জিহাদের অর্থ। আরবিতে এই অর্থেই জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু জঙ্গিবাদীরা এ শব্দে এমন এক লেবেল এঁটেছে যেন 'জিহাদ' হলো 'যুদ্ধ'-এর প্রতিশব্দ। এমনকি ১১ সেপ্টেম্বরের দুর্ঘটনার

মাওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর 'রিলিজিয়ন অব ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন, যখন মুহাম্মদ (স.) দেখলেন যে, লোকজন তাঁর কথায় কর্ণপাত করছে না এবং বোঝারও চেষ্টা করছে না, তখন আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিতেন এভাবে- 'তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?' (সূরা ইউনুস ৯৯)

পর বিশ্বব্যাপী জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইসলামী-জঙ্গি সমস্যা নিয়ে যত বক্তৃতা দিয়েছেন বা লিখেছেন, তাতে তারা জিহাদ শব্দের সঠিক ও ব্যাখ্যামূলক অর্থটা না দেখেই জঙ্গিদের বাতলানো অর্থে জিহাদ মানে যুদ্ধ- এই ধারণা পোষণ করে এসেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, কোরআন শরিফে যে বিষয়ে স্পষ্ট বলা আছে, সেখানে অন্য কোনো অর্থ-ব্যাখ্যা চলতে পারে না। নিজামী-চরমোনাই গংদের বাতলানো অর্থে জিহাদ বলতে যুদ্ধ, জিহাদ মানে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা এবং এসব অপকর্মের সাফাই হিসেবে 'ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ' বলে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা একাধারে মিথ্যা, বিকৃত ও ইসলাম-বিরোধী। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও চর্চা দিয়েই প্রমাণ করা সম্ভব, বর্তমান বিশ্বে জিহাদের নামে যে উন্মাদ নৃত্য ও উদভ্রান্তের কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে তা আদৌ জিহাদ নয়।

অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন, 'মুসলমানরা কি যুদ্ধ করেনি?' উত্তর হলো, 'হ্যাঁ করেছে।' তবে এটুকু উত্তর দিয়ে ইসলামের নামে যুদ্ধ বৈধ প্রমাণ করা যাবে না। কারণ কখন, কী পরিস্থিতিতে মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছে তা জানা ও বোঝা না থাকলে অর্ধ-সত্য জেনে বিভ্রান্তি বাড়বে। ইসলামের প্রথমদিকে মুসলমানদের যুদ্ধের চরিত্রটাই বা কী ছিল? কোরআনে সেই যুদ্ধ সম্পর্কে কী বলা আছে?

কোরআন থেকে যুদ্ধের যে নমুনা আমরা পাই তা হলো, মুসলমানদের যুদ্ধ করার প্রথম অনুমতি দেয়া হয় যখন তারা মক্কা থেকে মদিনায় চলে যায় এবং যখন তাদের ওপর আক্রমণ আসে তখন। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্যই যুদ্ধ করতে হয়েছে, অন্যের আত্মা ধ্বংসের জন্য নয়। বস্তুত, মদিনায় পৌঁছার পর জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। মদিনায় থাকা অবস্থায় এবং যুদ্ধকালীন যে সমস্ত সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেখানে জিহাদ শব্দটি অনেক বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মদিনায় অবস্থানের কয়েক বছর পরই মুহাম্মদ (স.) মক্কা আক্রমণ করার মতো শক্তি অর্জন করলেন। তখন তিনি কি মক্কায় রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন? না, তিনি তা করেননি। আর মক্কা বিজয়ের পর? পৃথিবীর ইতিহাসে রক্তপাতহীন এতো বড় বিজয় সম্ভবত দ্বিতীয়টি নেই। মক্কা বিজয়ের উপর তিনি সব অত্যাচারী-অবিশ্বাসীকে এই বলে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, 'ভাইসব! আজ তোমরা সবাই স্বাধীন, সবাই মুক্ত।' আমাদের আজকের উগ্র-জিহাদিরা কিন্তু রাসুল (স.)-এর এই শান্তির পথে হাঁটতে নারাজ।

মওদুদীনামা

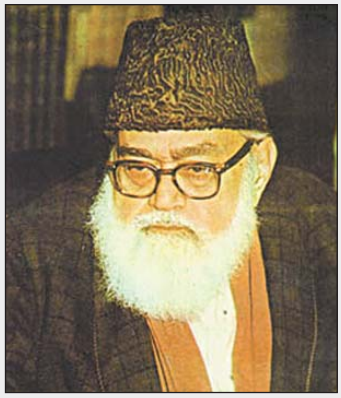

Rvgvqv‡Z Bmjvgxi cwZôvZv gljvbv Avej Awôjv gl``x

মহানবী মুহাম্মদ (স.) সুস্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন যে কোরআন এবং হাদিসকে আঁকড়ে ধরে রাখবে সে কোনোদিন পথভ্রষ্ট হবে না। এ কথা দ্বারা তিনি পরোক্ষভাবে ইসলামে গুরুবাদ বা যাজকবাদকে অনুৎসাহিত করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই যোগ্যতা আছে সরাসরি কোরআন-হাদিস থেকে সমাধান গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কোরআন, হাদিস নিয়ে কী বলল তা যেন মুসলমানদের ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না করে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ধর্মান্ধগোষ্ঠী মাওলানা মওদুদীকে আদর্শ মানে। তাদের কাছে কোরআন হাদিস বলতে এই সম্বন্ধে মাওলানা মওদুদী যা বলেছেন তা-ই সব। এটা অনেকটা ব্যক্তি– পূজার শামিল, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মওদুদীই প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯৪১ সালে হাজার বছর ধরে চলে আসা রাজনৈতিক ইসলামের দর্শনকে আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে জোড়াতালি দেন। মওদুদী বলছেন 'পৃথিবীর বুকে সকল রাষ্ট্র এবং সরকারকেই ইসলাম ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করে, যারা ইসলামী আদর্শ বা প্রকল্পের বিপরীতে অবস্থান করে। যখন সম্পদ আসবে তখন তারা অনৈসলামিক সরকারকে মুছে ফেলে সেই জায়গায় ইসলামী সরকারকে বহাল করবে।' (উৎস : জিহাদ ও ইসলাম)।

মূলত আধুনিক কালে ইসলামের নামে জিহাদ করার যে প্ররোচনা তা এসেছে মওদুদীর কাছ থেকে। মওদুদীর প্রতিষ্ঠিত দল জামায়াতে ইসলামী ও তাঁর অনুসারীরা সেই থেকে ইসলামের নামে মানুষ হত্যার কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

সম্পদ অর্জন হয়ে গেলেই যেহেতু ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাই জামায়াতে ইসলামী সম্পদ বানানোর কারখানায় পরিণত হয়েছে। ব্যাংক, বীমা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, পরিবহন, আবাসন প্রকল্প, সমবায় সমিতি, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি খাতে জামায়াত তার জাল বিছানোর কাজ শেষ করে এনেছে। আর সরকারের ভাগিদার হওয়ায় এ টার্গেট অর্জন তাদের জন্য আরো সহজ হয়ে গেছে।

আল কোরআনের ২৯ নম্বর সূরার নাম হলো 'আনকাবুত'। এটি মুহাম্মদ (স.)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বছরে অবতীর্ণ হয়। এই সূরায় জিহাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কারো ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ ব্যবহারের তাগিদ হিসেবে। নিশ্চিতভাবে এই ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রচেষ্টার সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো ইঙ্গিত ছিল না। ছিল নিজের অন্তরাত্মাকে বিশুদ্ধ ও কোমল করে ভালত্ব অর্জন করার জন্য সর্বোচ্চ শ্রম নিয়োগের তাগিদ।

এই সূরার ৬৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা আমার উদ্দেশে জিহাদ করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।' এই আয়াতে এটা স্পষ্ট যে সৎকর্ম ও ভালো কাজ করাকেই জিহাদ বোঝানো হচ্ছে, কোনো হানাহানি ও খুনোখুনি নয়।

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহর স্বভাবের অনুসরণ করুন'। আরেক জায়গায় আল্লাহ বলছেন, 'তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও' (অর্থাৎ আল্লাহর চরিত্রে যেসব গুণ রয়েছে সেসব গুণ অর্জন করা)।

যেখানে স্বয়ং আল্লাহ বলছেন তাঁর গুণের গুণাবলী অর্জন করতে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, যারা আল্লাহর

নিজামী-চরমোনাই গংদের বাতলানো অর্থে জিহাদ বলতে যুদ্ধ, জিহাদ মানে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা এবং এসব অপকর্মের সাফাই হিসেবে 'ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ' বলে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা একাধারে মিথ্যা, বিকৃত ও ইসলাম-বিরোধী। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও চর্চা দিয়েই প্রমাণ করা সম্ভব, বর্তমান বিশ্বে জিহাদের নামে যে উন্মাদ নৃত্য ও উদভ্রান্তের কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে তা আদৌ জিহাদ নয়

'জঙ্গি নেটওয়ার্কে যে হাজার দু'হাজার কর্মী কাজ করছে তাদের খরচ বিদেশ থেকেই আসছে'

মাওলানা ওবায়দুল হক
খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

সাপ্তাহিক ২০০০ : ইসলামের নামে শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই এরা এবং এদের অনুসারীরা বোমা মেরে দেশে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে, এটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : যারা বোমা মেরে নিরীহ মানুষ হত্যা করে ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারা তাগুত। অবাধ্য। এসব কাজ যারা করছে তারা ফাসাদে লিপ্ত। দেশের মধ্যে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং সাধারণ জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। বুঝতে হবে এরা ফিতনাবাজ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। এর পেছনে ভারত এবং আমেরিকার হাত আছে। ওরা ইসলামের নাম দিয়ে ইসলাম এবং মুসলমানকে হত্যা করতে চায়। এ জন্যই তারা এসব সন্ত্রাসীর গায়ে ইসলামের লেবাস লাগিয়ে তাদের এবং এর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত করা, যাতে করে লোকজন ইসলাম হতে দূরে সরে যায়। আরো বেশি করে বললে ধর্মীয় উন্মাদনার এই চিহ্ন দেখে মানুষ যেন ধর্ম হতে উৎসাহ হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিকভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এসবের বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

২০০০ : এদের পেছনে আমেরিকা ও ভারত টাকা খরচ করছে বললেন, এ ব্যাপারে আপনার হাতে কোনো প্রমাণ আছে?

উত্তর : আমার হাতে কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু এটা সহজেই অনুমান করে নেয়া যায়। ৬৩ জেলায় যে বোমা মারা হল, তাতে হাজার পাঁচশ টাকা খরচ করা হয়নি। লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এসব টাকা কোত্থেকে আসছে? আব্দুর রহমান-সিদ্দিকুর রহমানদের আয়-ইনকামের উৎস কী? তাদের তো কোটি টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য নেই। সুতরাং এ জঙ্গি নেটওয়ার্কে যে হাজার দু'হাজার কর্মী কাজ করছে তাদের খরচ বিদেশ থেকেই আসছে।

২০০০ : এদেরকে প্রতিরোধের উপায় কী?

উত্তর : ঐ তো আগেই বললাম সরকারকে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও চেষ্টা করতে হবে যেন দেশে সত্যিকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাহলে এদেরকে প্রতিরোধ করা যাবে।

২০০০ : দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। এটা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

উত্তর : ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের রায় বা মত প্রয়োজন। জনগণের মতামতকে ইসলামের দিকে ফেরানোর জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

২০০০ : জঙ্গিরা আমাদের সংবিধানকে অস্বীকার করে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে আপনাদের প্রণীত সংবিধানের রূপরেখা কি রকম হবে?

(এ প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে যান।)

আইন প্রতিষ্ঠার নামে বোমাবাজি আর মানুষ হত্যা করছে তারা কি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত?

আল্লাহ্র যে নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম রয়েছে তার মধ্যে কোরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে 'রহমান' ও 'রহিম' নাম দুটি, যার অর্থ 'পরম করুণাময়' ও 'পরম দয়ালু'। কোরআনে দয়ালু, পরম দয়ালু, পরম করুণাময় (রহমানির রহিম)- এই নামগুলো ব্যবহৃত হয়েছে ১২৪ বার। আল্লাহ নিজের গুণ বোঝাতে 'দয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ১৭৩ বার। তাঁর উল্লেখযোগ্য এই গুণগুলোর বিপরীত গুণ হলো 'ক্রোধ' এবং 'ক্রুদ্ধ'। সারা কোরআন শরিফে তিনি ক্রোধ শব্দটি মাত্র তিনবার ব্যবহার করেছেন (সূরা ফাতিহা ৭, বাকারা ৯০ ও আল ইমরান ১১ নম্বর আয়াতে)। আর ক্রুদ্ধ শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন মাত্র ৪ বার (আল মাইদা,

ÔBmjv‡g mš¿vmev‡`i †Kv‡bv aviYv †bBÕ

nvi“b Bqvwnqv
wekL¨vZ Bmjvgx wPšÍvwe`

তুরস্কের প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার আদনান ওকতার যিনি হারুন ইয়াহিয়া নামেই বেশি পরিচিত। তিনি বলেন- ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ হত্যা অগ্রহণযোগ্য। আমাদের এটা মনে রাখা দরকার যে, ওয়াশিংটন এবং নিউইয়র্কে যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা যীশুকে ভালোবাসত (খ্রিষ্টান), মুসাকে (আ.) ভালোবাসত (ইহুদি) এবং তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। ইসলাম ধর্ম অনুসারে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা এতো বড় অপরাধ যে যদি আল্লাহতায়ালা ক্ষমা না করেন, তাহলে হত্যাকারীকে অবশ্যই জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে।

সত্য ইসলামে 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদের' কোনো ধারণা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ ইসলামের সঙ্গে জঙ্গিবাদের কোনো যোগসূত্র নেই। বরং ইসলাম ধর্মে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিহত করে বিশ্বে শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বলা হয়েছে।

আনফাল, আল মুজাদিলা ও আল মুম্তাহানা)।

অথচ বর্তমানে জঙ্গিরা মানুষ হত্যা করছে, ইসলাম প্রচারের নামে মানবতা ও মানবিকতার ওপর দলন-পীড়ন করছে। আর যাদের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং ইসলামও যে কর্তৃত্ব দেয়নি, তাদের ওপরই তারা জোর করে শরিয়া প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এ ব্যাপারে তারা যদি মুহাম্মদ (স.)-এর আচরণের দিকে তাকাত তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখতে পেত। মাওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর 'রিলিজিয়ন অব ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন, যখন মুহাম্মদ (স.) দেখলেন যে, লোকজন তাঁর কথায় কর্ণপাত করছে না এবং বোঝারও চেষ্টা করছে না, তখন আল্লাহ তাকে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিতেন এভাবে- 'তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?' (সূরা ইউনুস ৯৯)

তখন একটি দল ছিল যারা মুহাম্মদ (স.)-এর কথা শোনতো এবং মানতো। আরেক দল ছিল যারা তাঁর কোনো আহ্বানে পাত্তাই দিত না। এদের জন্য তিনি মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে উঠতেন, হতাশ হয়ে যেতেন। কিন্তু কোরআনে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্য ধারন, ক্ষমা এবং সহ্য করার জন্য উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ বলছেন, 'তারা এই বাণীতে বিশ্বাস না করলে তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে তুমি হয়তো দুঃখে নিজেকে শেষ করে ফেলবে।' (সূরা কাহাফ্ ৬)।

> মওদুদী বলছেন 'পৃথিবীর বুকে সকল রাষ্ট্র এবং সরকারকেই ইসলাম ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করে যারা ইসলামী আদর্শ বা প্রকল্পের বিপরীতে অবস্থান করে। যখন সম্পদ আসবে তখন তারা অনৈসলামিক সরকারকে মুছে ফেলে সেই জায়গায় ইসলামী সরকারকে বহাল করবে।' (উৎস : জিহাদ ও ইসলাম)

ধর্মে কোনো জোরাজুরি নেই

স্পষ্টতই কোরআন ও হাদিসের আলোকে বোমাবাজি করে, মানুষ খুন করে জিহাদ করার চেষ্টা করা কোনোভাবেই স্বীকৃত নয়, বৈধ নয়। কোরআনে ধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, সেখানে কোনো রকম জবরদস্তির কথা বলা হয়নি। সূরা কাহাফে বলা হয়েছে, "বল 'সত্য' এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে; যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা সে অবিশ্বাস করুক।" (সূরা কাহাফ্ ২৯)। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, 'তাহলে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?' (সূরা ইউনুস ৯৯)। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, 'লা ইকরাহ ফিদদীন' অর্থাৎ 'ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।' (সূরা বাকারা, ২৫৬)। সূরা কাফিরুনে আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন, 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমাদের।' (সূরা কাফিরুন, ৬)।

মুহাম্মদ (স.)কে আল্লাহ্ এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে, তিনি যদি সহজ-সরল ভাষায় সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটা লোকজনের কাছে বলে দেয় তাহলেই তাঁর মিশন শেষ। এরচেয়ে বেশি কিছু তাঁর কাছ থেকে আশা করা হবে না। মানুষ তার দাওয়াত গ্রহণ করেছে কি করেনি এটা দেখার দায়িত্ব তাঁর নয়। তাঁর দায়িত্ব ছিল শুধু এটুকু জানিয়ে দেয়া, কোনটা সঠিক পথ, আর কোনটা বিপথ। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশনা অনুসারে তিনি মানুষকে আরো জানিয়েছেন, কোন পথে চললে কী ফল হবে। অর্থাৎ নিজের পছন্দের ব্যাপারে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন। আল্লাহ্ জোর করে, বোমা মেরে কাউকে তার পথে চলতে বাধ্য করতে চান না। তিনি মানুষকে বোঝার, বিচার করার ও স্বাধীনভাবে পছন্দের ক্ষমতা দান করেছেন।

আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (স.) যদি কারো ওপরে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে জোর না খাটিয়ে থাকেন, তাহলে কারা এই তালিবান, জেএমবি আর খতিব মাওলানা ওবায়দুল্লাহ? কোন ইসলামী আইনের বলে তারা জোর-জবরদস্তি আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে? এরা যা করছে তা করার কোনো বৈধ অধিকার তাদের নেই। এদের ঘৃণা করা দরকার, বিশেষ করে মুসলমানদের এই দায়িত্ব সবার আগে। কারণ এরা ইসলামের নাম নিয়ে ইসলামের ওপরই এক অমোচনীয় কলঙ্ক চাপিয়ে দিচ্ছে।

কুফর কী, কারা কাফির

মাওলানা মোহাম্মদ আলী কুফর শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কোরআনের ব্যাখ্যাকারকদের বেশির ভাগই কুফরের অর্থ করেছেন 'সত্যকে অস্বীকার'। মূলত এর অর্থ 'আবৃত করা' বা 'গোপন করা'।

প্রাথমিকভাবে কুফর বলতে বোঝাতো ইসলামপূর্ব যুগের লোকদের আল্লাহর একত্ববাদ ও নবীর নবীত্বের অস্বীকারকে। এ ছাড়াও কুফর শব্দের আরেকটি অর্থ তখন প্রচলিত ছিল, সেটি হলো বেঁচে থাকার আবশ্যিক উপাদান বা উপকরণসমূহ গোপন করে ফেলা বা প্রত্যাহার করা যা স্রষ্টা মানবজাতির ভালোর জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি চান যে এগুলো সবার কাছেই সমান সহজলভ্য হয়ে থাক। এই অর্থে দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং সম্পদ মজুদকারীরাও কুফর করে। অর্থাৎ তারা কাফির। অথচ ইসলামের ধ্বজাধারী মাওলানা মাসুদের ব্যাংকে থাকে কোটি কোটি টাকা। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান থাকাকালীন শুধু টেলিফোন বিল

পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদার ৩২ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই বলা আছে যে অন্যায়ভাবে কেউ যদি কাউকে মারে সে যেন পুরো মানবজাতিকেই মারলো। আর কেউ যদি কারো প্রাণ রক্ষা করলো তাহলে যেন সারা মানবজাতিরই প্রাণ রক্ষা করলো

দিয়েছেন কোটি টাকা। ড. গালিবের টাকা-পয়সার হিসাব নেই। বেনামে পাসপোর্ট করে তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেন। অথচ কথায় কথায় অন্যদের 'কাফের' ও 'মুরতাদ' উপাধি দেন তারাই।

মুহাম্মদ (স.) কাফের শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ- 'অকৃজ্ঞতা'ও কুফরের সমতুল্য। একইভাবে অতিভোজনকেও মহানবী (স.) কাফেরের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদি তাই হয়, তাহলে তো তথাকথিত সব মোল্লার নামই কুফ্ফারের (কাফের শব্দের বহুবচন) খাতায় উঠে যাবে। মিসরে কৃষকদের 'কাফের' বলা হয়। কারণ তারা মাটিতে 'শস্যদানা' বা 'বীজ' লুকিয়ে রাখে।

মহানবী (স.) বলেছেন, 'কেউ যদি অন্যায়ভাবে অন্যকে কাফের বলে, তাহলে সে নিজেই কাফের হয়ে যায়।' অর্থাৎ যাকে কাফের বলা হচ্ছে সে যদি নির্দোষ হয়, তাহলে যে বলেছে সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে আমাদের চরমোনাইর পীর, দেওয়ানবাগী, জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কী বলা যায়? তারা তো প্রকাশ্য রাজপথে একে অন্যকে 'কাফের' 'মুরতাদ' 'খারিজ'সহ নানা উপাধিতে ভূষিত করে। একই ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে নেমে যদি তারা একে অন্যকে এভাবে কাফের বলে, তাহলে ঐ ধর্মের একমাত্র আদর্শ মহানবী (স.)-এর সংজ্ঞা অনুসারে তারা সবাই আসলে কী?

হাদিস অনুসারে এক মুসলিম যদি অন্য মুসলিমকে হত্যা করে তাহলে সেও কাফের হয়ে যায়। জামাআতুল মুজাহিদিন, হরকাতুল জিহাদ, তালেবানরা কী করছে? তাদের হাতে

'ইসলাম ধর্মে আইন হাতে তুলে নেওয়ার কোনো বিধান নেই'

ড. শমসের আলী
ভাইস চ্যান্সেলর, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি

পবিত্র কোরআনের সুরা মায়িদার ৩২ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই বলা আছে যে অন্যায়ভাবে কেউ যদি কাউকে মারে সে যেন পুরো মানবজাতিকেই মারলো। আর কেউ যদি কারো প্রাণ রক্ষা করলো তাহলে যেন সারা মানবজাতিরই প্রাণ রক্ষা করলো। ঠিক এই ধারণাটিই অসাধারণভাবে একটি কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন ১৭ শতকের একজন কবি জন ডন। তাছাড়া আরেকটা বিষয় দেখুন, আমাদের প্রিয় নবী (স.) ১২ বছর নিজ মাতৃভূমিতে নির্যাতিত হলেন, অবশেষে রাতের আঁধারে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন- কই তিনি তো কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেননি। মদিনায় গিয়েও তিনি কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেছেন একথা বলা যাবে না। বরং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আর তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। ইসলাম ধর্মে আইন হাতে তুলে নেওয়ার কোনো বিধান নেই।

'যারা বোমা মেরে ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারা ভ্রান্ত পথের অনুসারী'

অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হযরত মুহাম্মদ (স.) একজন প্রভাবশালী বংশের নবী ছিলেন। তিনি যখন তায়েফে গিয়ে ইসলাম প্রচার করলেন, তখন পাথর নিক্ষেপ করে তাকে রক্তাক্ত করা হলো। ইচ্ছা করলে তিনি তাদের জন্য শাস্তি চাইতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের উম্মতেরা যখন বার বার সত্য পথের আহ্বান অগ্রাহ্য করেছে এবং অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়েছে তখন তারা দোয়া করেছেন- হে আল্লাহ, এদের তুমি ধ্বংস করে দাও। অথচ রাসুলুল্লাহ (স.) রক্তাক্ত অবস্থায়ও অত্যাচারীদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেছেন। তাদেরকে কখনো অভিশাপ দেননি। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নবী, রাসুল বা কোনো মহামানব সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নিজ থেকে কখনো শক্তি প্রয়োগ করেননি। পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে সেগুলোর প্রত্যেকটির মূলমন্ত্র ছিল- শান্তি। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস ও অশান্তি দূর করা।

যারা বোমা মেরে ইসলাম কায়েম করতে চায়, তারা ভ্রান্ত পথের অনুসারী। পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে বলেই স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে শান্তির পথে পরিচালনার জন্যই নবী- রাসুল প্রেরণ করেছেন। তারা মানুষকে সত্যের পথে ডেকেছেন, শান্তির পথে ডেকেছেন।

জঙ্গিরা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করবে কী দিয়ে? বোমাবাজি দিয়ে? ইসলামী আইন কেন প্রতিষ্ঠা করবে? শান্তির জন্য? এরা তো বোমা মেরে দেশে অশান্তি, অরাজকতার সৃষ্টি করছে। বোমা মেরে, অশান্তি দিয়ে নিশ্চয়ই শান্তি সৃষ্টি করা যায় না। আমাকে যে আল্লাহ বানিয়েছেন, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানকেও সেই আল্লাহই বানিয়েছেন। সকলকে তিনি সমান ভালোবাসেন। কাউকে কম ভালোবাসেন না। নবী করিম (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া দেখায় না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া দেখান না।' আমাদের রাসুল (স.) বোমা দিয়ে ইসলাম কায়েম করেন নাই। ধর্ম প্রচার করতে বল প্রয়োগও করেন নাই। তিনি যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, সবগুলো যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক।

একবার সাহাবীরা যুদ্ধ জয় করে আসে। অর্থাৎ আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। তারা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে বলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমরা জয়ী হয়েছি,' রাসুলুল্লাহ (স.) তখন বলেন, 'যা আকুম মিনাল জিহাদিল আসগারি ইলাল জিহাদিল আকবারি', অর্থ: 'তোমরা একটা ছোট্ট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসেছ'। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হবার চেয়ে তোমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে যে অপশক্তি আছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বড় যুদ্ধ।

যারা মারা পড়ছে তাদের বেশির ভাগই তো মুসলমান।

'কাফের' বনাম 'মোনাফেক'

জঙ্গিদের অনেকেই হয়তো জানে না যে জাহান্নামের নিকৃষ্টতম দোজখটি কাফেরদের জন্য বরাদ্দ নয় বরং মোনাফেকদের জন্য। এ কথা আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে কোরআনে বলেছেন। মোনাফেক হলো তারা, যারা অন্তরে কোনো কিছু গ্রহণ না করে বাইরে প্রচার করে বেড়ায় যে তারা তাতে বিশ্বাস করে। এরা কাফেরের চেয়েও অধম। কারণ কাফের তো অন্তত পক্ষে স্বীকার করে যে সে কী বিশ্বাস করে। আর মোনাফেকরা অন্তরে বিশ্বাস করে এক, বাইরে প্রচার করে আরেক। তথাকথিত জঙ্গিরা কি ভেবে দেখেছে কারা মোনাফেক হয়? যে অবিশ্বাস করে সে তো ঘোষণা দিয়েই অবিশ্বাস করে; সে মোনাফেক নয়। কিন্তু যারা বাইরে প্রচার করে যে আমরা আল্লাহ্র সৈনিক অথচ আল্লাহর গুণের চর্চা করে না, তাদের পক্ষেই একমাত্র মোনাফেক হওয়া সম্ভব।

মুহাম্মদ (স.) কাউকে কাফের বা মোনাফেক হিসেবে বিচার করতেন না। এমনকি যারা ঘোষিত মোনাফেক ছিল তাদেরকেও না। মদিনায় যখন মোনাফেকদের কুখ্যাত সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যান তখন মুহম্মদ (স.) তাঁর কবরে গিয়ে প্রার্থনা করেন এবং তাকে মুসলিম হিসেবে সম্বোধন করেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ রকম যে, যে-ই আল্লাহর বান্দাকে কাফের বলুক না কেন, সে নিজেই কুফরের কাছাকাছি চলে যায়।

শরিয়ার নামে ভন্ডামি

মুহাম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর পরও মুসলমান জনসংখ্যার পরিমাণ দ্রুত থেকে দ্রুততর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে শাসন করার জন্য নবী'র (স:) মৃত্যুর ২০০ বছর পর শরিয়া আইনের উদ্ভব ঘটে। সেটা ৭ম-৮ম শতাব্দীর কথা। বিখ্যাত চার ইমামের শিষ্যরা মিলে তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষকের নামে এ আইনগুলোকে একত্রিত (কোডিফাই) করেন। কোরআন ও হাদিসের আলোকে এই কাজগুলো তারা করে সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব অনুধাবন থেকে। এভাবেই 'ফিকহ্' (আইনশাস্ত্র) শব্দের উদ্ভব ঘটে। যার অর্থ 'মানব যুক্তি' (হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং)। সেই একতাবদ্ধ আইনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ক. হুদুদ ও খ. তা'শির। 'হাদ্' শব্দ থেকে 'হুদুদ' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ 'সীমা'। বেশির ভাগ হুদুদ আইনই অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত। এবং কোনো পরিস্থিতিতেই এ আইন পরিবর্তনযোগ্য নয়। যুগে যুগে এ অপরিবর্তনীয়তার সুযোগ নিয়েছে কতিপয় ব্যাখ্যাকারকরা। শরিয়া আইনের কথা বলতে

একবার সাহাবীরা যুদ্ধ জয় করে আসে। অর্থাৎ আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। তারা রাসুলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে বলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমরা জয়ী হয়েছি,' রাসুল্লাহ (স.) তখন বলেন, 'যা আকুম মিনাল জিহাদিল আসগারি ইলাল জিহাদিল আকবারি', অর্থ: 'তোমরা একটা ছোট্ট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে এসেছ'। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হবার চেয়ে তোমাদের নিজেদের অভ্যন্তরে যে অপশক্তি আছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বড় যুদ্ধ

বলতে তারা এক সময় কোরআনের স্পিরিটেরও বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বসেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবুল আ'লা মওদুদী।

আগেই বলা হয়েছে ধর্মের নামে কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি বা জোরাজুরির ব্যাপারে ইসলাম ঘোর বিরোধী। কিন্তু নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা শরিয়ার নামে এই কাজটিই মূলত করতে চায়। চাপিয়ে দিতে চায়। কোরআনের দোহাই দিয়ে শরিয়ার নামে তারা কোরআন বিরোধী কী কী করেছে তার কিছু নজির দেখা যাক : স্বামী যদি 'তালাক' উচ্চারণ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তালাক হয়ে যায়- এমন কথা কোরআনের কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ শরিয়া আইনে তা বৈধ। চুরির অপরাধে চোরের হাত কেটে দেয়াই কোরআনের নিয়ম। একই সঙ্গে ক্ষমার কথাও বলা আছে। কিন্তু এ নিয়মকে স্থান, কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই হুঁশজ্ঞান শরিয়ার ধ্বজাধারীদের নেই। একবার এক চোর চুরি করে ধরা পড়লো। বিচার করবেন হযরত উমর (রা.)। যার সম্পর্কে মুহম্মদ (স.) মন্তব্য করেছেন, 'আমার পর যদি কোনো নবী আসতো তবে সে হতো উমর।' তিনি চোরের শাস্তি দিলেন। না তিনি হাত কেটে ফেলেননি। কেননা তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে আইনের এই যে ব্যবহার তা আর সবাই বুঝলেও জঙ্গি, খামখেয়ালিপূর্ণ জিহাদিরা বোঝে না, অথচ সবক দিয়ে বেড়ায় যে তারা ইসলাম কায়েমের সংগ্রামে লিপ্ত।

শেষ কথা

কিছুদিন আগে সাতক্ষীরায় যে জঙ্গি ধরা পড়েছে তার বক্তব্য আরো বিস্ময়কর। তার কথা অনুসারে জেএমবির হাই কমান্ড তাকে সাতক্ষীরায় এক ম্যাজিস্ট্রেটকে মেরে ফেলার মিশন দিয়ে পাঠায়। সে কয়েক দিন ম্যাজিস্ট্রেটকে ফলো করে দেখল একমাত্র তারাবির নামাজের সময় ছাড়া অন্য সব সময় তার গার্ড থাকে। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল তারাবির নামাজে যাওয়ার সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে মারতে হবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে তার আগেই ধরা পড়ে।

যারা ইসলাম কায়েমের জন্য মরিয়া, দেশ জুড়ে বোমা-তান্ডব চালাচ্ছে তারাই আবার মসজিদে নামাজ আদায় করতে যাওয়ার পথে একজন মুসলমানকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। তাহলে এদের উদ্দেশ্য আসলে কী? কাদের স্বার্থে তারা বোমা ফাটিয়ে ইসলাম কায়েম করতে চায়?

ইসলামের মর্মবাণী হলো শান্তি। ইসলাম মানেই শান্তি। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ক্লেশ, দুর্যোগ, দুর্ভোগ, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। জালিম শক্তির জুলুম সহ্য করে তিনি মুসলিম উম্মাকে শান্তিবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইসলাম কখনোই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাকে অনুমোদন দেয়নি। ধর্মের নামে আত্মঘাতী বোমা মেরে মানুষ হত্যাকে ইসলাম কখনোই অনুমোদন করে না। পবিত্র কোরআনুল করীমে পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, 'যে অন্যায়ভাবে কোনো একজনকে হত্যা করল সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো'। আল কোরআনে আরো বলা হয়েছে, 'ফিতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি হত্যার চেয়ে জঘন্য।'

নবী মুহাম্মদ (স.) বলেছেন 'দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহজ পন্থা অবলম্বন করবে এবং চরম পন্থা অবলম্বন করবেন না।' অথচ আজ তথাকথিত কিছু ধর্মীয় সংগঠনের ব্যানারে অধর্ম শক্তির বাড়াবাড়ি চলছে। মূলত তারা কলুষিত করছে ধর্মকে, মানবতাকে। অস্থিতিশীল করা হচ্ছে সারা দেশকে। বিপদে ফেলা হচ্ছে দেশের মানুষকে। এইসব ধর্মব্যবসায়ী জঙ্গি উগ্রবাদীদের রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব সবার। এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হবে ইসলামের জন্য সত্যিকারের কাজ, মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

[কোরআন শরিফের আয়াতগুলো বাংলা অনুবাদে অনুসরণ করা হয়েছে মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কোরানশরিফ: সরল বঙ্গানুবাদ' গ্রন্থটি।]